যোগ্য আলেম তৈরীতে
উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
ও উম্মতের জিম্মাদারী

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ
আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

দু'টি কথা **১০**

ইলমের ফযীলত, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা **২১**

সিন্ধু থেকে বিন্দু ২১

ইলমের পথে সৃষ্টিকুলের নৈস্বর্গিক অভ্যর্থনা ২৩

ইলমের পথে শয়তানের মহা ষড়যন্ত্র ২৫

যোগ্য আলেমগণই দ্বীনের কান্ডারী ৩১

যোগ্য আলেম না থাকলে কুরআন-হাদীস থাকা সত্ত্বেও ইলম উঠে যাবে ৩১

যোগ্য আলেমগণই উপরোল্লিখিত মর্যাদাসমূহের অধিকারী ৩৪

সকল বিদ্যাই নির্ভর করে বিদ্যানদের উপর ৩৫

যোগ্য আলেম কারা? ৩৬

যোগ্য হওয়ার জন্য কী কী বিষয় প্রয়োজন? ৩৬

দ্বীন ও উম্মতের হেফাজতে যোগ্য আলেমগণের ভূমিকা ও কুরবানী ৪১

যোগ্য আলেমের উপস্থিতি নিশ্চিত করা উম্মতের গুরুদায়িত্ব ৪২

যোগ্য আলেম তৈরীতে সালাফের সচেতনতা, তাঁদের ভূমিকা ও কর্ম পদ্ধতি **৪৩**

যোগ্য হওয়ার জন্য বড়দের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় থাকার আবশ্যকতা ৪৩

সাহাবায়ে কেরামের সুদীর্ঘ সময় বড়দের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন ৪৪

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সার্বক্ষণিক পড়ে থাকা ৪৫

বড় সাহাবীদের সান্নিধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ৪৫

তাবেয়ীগণের দীর্ঘ সময় বড়দের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন ৪৬
আমর ইবনে মায়মূন হযরত মুআয ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর সান্নিধ্যে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন ৪৬
হযরত ইবনে আব্বাসের সান্নিধ্যে তাউস রহ. এর চল্লিশ বছর ৪৭
হযরত ইবনে আব্বাসের সান্নিধ্যে মায়মূন ইবনে মেহরানের বিশ বছর ৪৭
একেকজন তাবেয়ী উস্তাদের সান্নিধ্যে ত্রিশ বছর অবস্থান করতেন ৪৭
ফজরের পূর্ব থেকে উস্তাদের দরজায় তাবেয়ীগণের অবস্থান ৪৮
হযরত আলকামা রহ. এর সারা বছরে একদিনও অনুপস্থিত না থাকা ৪৮
ইমামগণের দীর্ঘ সময় উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন ৪৮
ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. ইমাম হাম্মাদের সোহবতে পুনরায় আঠারো বছর ৪৮
ইমাম মালেক রহ. তের বছর ইবনে হুরমুয রহ. এর সান্নিধ্যে ৪৯
ইমাম আহমদ রহ. একাধারে পাঁচ বছর হুশায়ম রহ. এর সান্নিধ্যে ৪৯
ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আযমের সান্নিধ্যে একাধারে সতের বছর ৫০
ইবনে ওয়াহাব রহ. বিশ বছর ইমাম মালেক রহ. এর সান্নিধ্যে ৫০
সালাফের নিকট ইলম অর্জনে একাগ্রতা ও নিরবচ্ছিন্নতার গুরুত্ব ৫১
উস্তাদের দরস ছুটে যাওয়ার ভয়ে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ছেলের কাফন-দাফনে শরীক হননি ৫২
ইমাম মুনযিরী রহ. ছেলের দাফনে অংশগ্রহণ করেননি ৫২
তালিবুল ইলমদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ৫৩
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালিবুল ইলমগণের জীবিকার ব্যবস্থা করতেন ৫৩
হযরত আবু হুরায়রা রা. কে ইলম অর্জনে নবীজীর সহযোগিতা ৫৪
উপার্জনকারী ভাইকে তালিবুল ইলম ভাইয়ের ভরণ-পোষণে নবীজীর উৎসাহ প্রদান ৫৪
ওমর রা. এর খেলাফতকালে বাইতুল মাল থেকে তালিবুল ইলমদের ভাতা প্রদান ৫৫
মেধাবী তালিবুল ইলমদেরকে সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত সহযোগিতা ৫৫

মেধাবী তালিবুল ইলমদেরকে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ব্যক্তিগত সহযোগিতা ৫৬
ইলম অর্জনের জন্য হযরত ইবনে ওমর রা. স্বীয় গোলাম নাফে রহ. কে আযাদ করে দেন ৫৬
মুসলিম শাসনামলে যোগ্য আলেম তৈরীর উন্নত ব্যবস্থা ৫৭
যোগ্য আলেম তৈরীর জন্য ওমর ইবনে আ. আজীজ রহ. এর মোটা অংকের ভাতা নির্ধারণ ৫৭
খলীফা হারুনুর রশীদ রহ. এর যুগে যোগ্য আলেম তৈরীর উন্নত ব্যবস্থা ৫৭
সেলজুক আমলে যোগ্য আলেম তৈরীর জন্য নিযামুল মুলকের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা ৫৮
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. এর শাসনামলে যোগ্য আলেম তৈরীর ব্যবস্থা ৬১
উসমানী খিলাফতে উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন ও তাদের ভরণপোষণের উন্নত ব্যবস্থাপনা ৬২
উসমানী সুলতান সুলাইমান আল-কানূনী কর্তৃক মুফতী আবুস সাউদ আফিন্দী রহ. এর সম্মান ও মূল্যায়ন ৬২
যোগ্য আলেম তৈরীতে বড় আলেমগণের ব্যক্তিগত সহযোগিতা ৬৩
ইমাম আযম রহ. স্বীয় মেধাবী ছাত্রদের ভরণ-পোষণ করতেন ৬৩
ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর ঘটনা ৬৩
ইমাম শাফিয়ী রহ. কে ইমাম মালেক রহ. এর আর্থিক সহযোগিতা ৬৪
ইমাম শাফিয়ী রহ. কে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর আর্থিক সহযোগিতা ৬৫
স্বীয় ছাত্র রবী ইবনে আবী সুলাইমানকে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর আর্থিক সহযোগিতা ৬৬
যোগ্য আলেম তৈরীতে ভারত উপমহাদেশের শাসকদের ভূমিকা ৬৭
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পর উপমহাদেশে দ্বীনী শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ৭০
যোগ্য আলেম তৈরীর চালিকাশক্তি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো বৃটিশরা ধ্বংস করে দেয় ৭০
ব্যাপকভাবে যোগ্য আলেম তৈরীর ব্যবস্থা আগের মত চালু থাকেনি ৭১

ইলমের গ্রহণযোগ্য স্তরে পৌঁছার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অধ্যয়ন আবশ্যক ৭২
উচ্চশিক্ষার জন্য দীর্ঘ সময় আবশ্যক কেন? ৭২
দাওরায়ে হাদীস বা তাখাসসুসই পড়াশোনার শেষ স্তর নয় ৭৩
দ্বীন রক্ষায় বিজ্ঞ আলেমগণের বিকল্প নেই ৭৬
বিজ্ঞদের ছাড়া কোন বিদ্যাই নিরাপদ নয় ৭৭
সকল বিদ্যার ন্যায় দ্বীনী ইলমে বিজ্ঞ হওয়ার জন্যও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন ৭৮
বিজ্ঞদের অধীনস্থতা ছাড়া সাধারণদের জ্ঞান নিরাপদ নয় ৭৯
বিজ্ঞদের ছাড়া সাধারণদের জ্ঞান কাজে আসে না, বরং ক্ষতির কারণ হয় ৭৯
চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সমরবিদ্যা থেকে দুটি উদাহরণ: ৮০
বিজ্ঞদের জ্ঞানের কল্যাণ সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে সাধারণ জ্ঞানীদের প্রয়োজন হয় ৮১
দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞ আলেম ছাড়া সাধারণ আলেমদের জ্ঞান কাজে আসে না ৮২
ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা ও অবক্ষয় রোধে যোগ্য আলেম তৈরীর বিকল্প নেই ৮৪
বহির্শত্রুর আক্রমন থেকে আত্মরক্ষায় বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন ৮৪
আভ্যন্তরীন অবক্ষয় রোধে বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন ৮৪
মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন ৮৫
এ উপলব্ধি পূর্বসুরীদেরকে যোগ্য আলেম তৈরীতে জান-মাল কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল ৮৫
উচ্চশিক্ষা চালু থাকলেই ইলমে দ্বীনের অন্যান্য প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হবে ৮৭
দীর্ঘ মেয়াদি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার জন্য চাই সদিচ্ছা, সুপরিকল্পিত রুপরেখা, সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা ৮৯
ইলমের পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার অসীম ফযীলত ও অফুরন্ত সাওয়াব ৯১
নেক আমলের সাওয়াব কম বেশি হওয়ার ভিত্তি ৯২
প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য ৯৫

بسم الله الرحمن الرحيم

দু'টি কথা

সূচনা

আজ থেকে প্রায় তিন যুগ আগের কথা। সময়টি ছিল ১৪০৬-০৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৬-৮৭ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষ। ঐ বছর আমি দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করি। এরপর পাকিস্তানের অন্যতম দ্বীনী বিদ্যাপিঠ জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া আল্লামা বানূরি টাউনে দু'বছর تخصص فی الفقه বিভাগে (উচ্চতর ফিকহ বিভাগে) অধ্যয়নরত থাকি। সেখানে থাকাকালীন ১৪০৮-০৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের শেষের দিকে দারুল উলূম হাটহাজারীর মুহতামিম (মহাপরিচালক) শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব রহ. এর পক্ষ থেকে একাধিক পত্র আমার নিকট পৌঁছে। সর্বশেষ ১লা রমযান ১৪০৯ হিজরীতে হযরতের স্বহস্তে লিখিত একটি পত্রও অধমের হস্তগত হয়।

অধমের প্রতি হযরতের স্নেহ মমতা ও সুধারণাবশত হযরত আমাকে দেশে ফিরে এসে দারুল উলূম হাটহাজারীতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার আদেশ করেন এবং অধমের মাধ্যমে দারুল উলূম হাটহাজারীতে স্বতন্ত্রভাবে تخصص فی الفقه الاسلامی বিভাগ চালু করার ব্যাপারেও ইঙ্গিত প্রদান করেন।

ফলে এ শিক্ষাবর্ষ শেষ করে আমি দেশে ফিরে আসি এবং শ্রদ্ধেয় আব্বাজান শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা এহসানুল হক সন্দীপী রহ. এর অনুমতিক্রমে ১৪০৯-১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি।

অত্র জামেয়ায় যোগদান করার পর সে বছরই মুরুব্বিদের নেক নজর ও সুধারণার ভিত্তিতে তাদের ছত্রছায়ায় অধমের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে تخصص فى الفقه বিভাগের সূচনা করা হয়[১]। হাটহাজারী মাদরাসার সকল আসাতেযায়ে কেরাম ও মুরুব্বিদের উপস্থিতিতে হযরত মুহতামিম সাহেব শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. অধমের হাতে এ বিভাগের চাবি অর্পণ করেন। সেখানে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর (শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব রহ.) এবং মুফতী সাহেব হুজুর (মুফতীয়ে আজম হযরত আল্লামা মুফতী আহমদুল হক সাহেব রহ.)-ও উপস্থিত ছিলেন। فلله الحمد أولا وآخرا. । এভাবেই শুরু হয় আমার কর্মজীবনের নবযাত্রা।

স্বপ্ন ও আশা

তখন থেকেই বড়দের দুআ ও ছায়ায় আমি আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের নিয়ে লক্ষ্যপানে এগুতে শুরু করি। আমার অভিজ্ঞতার ছোট্ট ঝুলিটি তাদের সামনে উম্মুক্ত করে ধরে থাকি, যেন তারা এর থেকে পূর্ণ উপকৃত হতে পারে। ইলমের পথে আমাদের বিভিন্ন দুর্বলতার ব্যাপারে তাদেরকে যথাসাধ্য সচেতন করতে চেষ্টা করি, যেন তারা নিজেদেরকে শুধরে নিয়ে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে।

সাথে সাথে আমি এও চিন্তা করতে থাকি, কিভাবে রাসূলের মেহমান এসকল তালিবুল ইলমের ইলমী জীবনকে জ্যোতির্ময় করা যায়? কিভাবে তাদের ইলমের পথকে সুগম করা যায়? পারিপার্শ্বিক সকল ঝায়ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখে ইলমের তলবে কিভাবে তাদেরকে গভীরভাবে নিমজ্জিত রাখা যায়? এবং তাদের ইলমী খোরাক বাড়ানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

শুধু ছাত্রদেরকেই নয় আমার সঙ্গী-সাথী ও সহকর্মীদেরকেও এ ব্যাপারে সজাগ করতে চেষ্টা করি এবং আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনাকে তাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করি।

---

[১] এর আগে تخصص في الفقه এর জন্য স্বতন্ত্র কোন বিভাগ ছিল না। যৌথ একটি বিভাগ ছিল সম্ভবত دورة تفسير নামে। যেখানে তাফসীর এবং ফিকহ উভয় ফনেরই কিছু কিছু কিতাব পড়ানো হতো।

আশার আকাশে কালো মেঘ

আশা ছিল স্বীয় দুর্বলতা ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সংকীর্ণতা হেতু আমার দ্বারা কোনো পরিবর্তন সাধিত না হলেও হয়তো তাদের দ্বারা কিছু একটা হবে। কিন্তু আমার সব আশাই নিরাশায় পরিণত হয়। কারো দ্বারা কোনো উন্নতি ও পরিবর্তন হওয়াতো দূরের কথা, আমি যেন আমার কোনো সহমর্মী পাওয়ার যোগ্যতাটাই হারিয়ে ফেলি। এতে আমার হৃদয় জগতে এক তোলপাড় শুরু হয়। আমার বক্ষদেশ বেদনার অনলে দগ্ধ হতে শুরু করে।

এর মাঝে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত করে সেটা হলো, আমাদের কওমি মাদরাসাগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার দিন দিন অবনতি। জ্ঞানের বিস্তৃতি, বুঝের গভীরতা আর উন্নত চিন্তা-চেতনা থেকে বহুদূরে অবস্থান।

শুরু থেকেই এসবের উপলব্ধি আমার মাঝে গভীরভাবে ছিল। আমাদের এ পরিবেশে ব্যাপকভাবে যে ইলমী দৈন্যতা আর স্বল্পজ্ঞানতুষ্টতা রয়েছে এর জন্য আমি তখন থেকেই ব্যথাতুর ছিলাম।

কিন্তু আমাদের অবস্থাতো এই যে, দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের অবস্থাও ততটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দেখা যাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠানই তার মূল প্রাণ হারাতে শুরু করেছে। অনেক জায়গায় মাদরাসার দালান-কোঠা, জায়গা-জমি ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবস্থাপনাগুলোই প্রতিষ্ঠানের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেকের যাবতীয় মেধা-শ্রম এগুলোর পিছনেই ব্যয় হচ্ছে। অথচ এগুলো একেবারেই গৌণ বিষয়।

হ্যাঁ, এসবের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বস্থানে এসব বিষয় জরুরীও।[২] কিন্তু

---

[২] বরং একসময় তো এমন ছিল যে মাদরাসাগুলোর পরিবেশ, দালান-কোঠা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি রাজপ্রাসাদের ন্যায় বা তার চেয়েও বেশি জাকজমকপূর্ণ ছিল। কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তা ফিকিরের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত ছিল। আর যারা মাদরাসার জিম্মাদার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তাদের কাজ ছিল শুধুই ছাত্রদের তালীম-তারবিয়াত নিয়ে চিন্তা ফিকির ও গবেষণা করা, এগুলোর মানোন্নয়ন করা ইত্যাদি। যার কারণে মৌলিক বিষয়ে তাদের মাঝে কোনো প্রকার ঘাটতি ও দুর্বলতা দেখা দিত না। সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক সুযোগ সুবিধাগুলোও তাদের অর্জন হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। প্রশাসনিক সব দায়দায়িত্ব থেকে ফারেগ হয়ে শুধুমাত্র শিক্ষা দিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে চিন্তা ফিকির করবে এরকম ব্যক্তির আজ বড় অভাব।

ইলমের ফযীলত, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা

সিন্ধু থেকে বিন্দু

ইলমের ফযীলত ও উলামায়ে কেরামের সুউচ্চ মর্যাদার যে সব বর্ণনা কুরআন, হাদীস ও জ্ঞানীদের বাণীতে রয়েছে তা এক মহাসমুদ্র। আমরা এখানে সিন্ধু থেকে কেবলমাত্র এক বিন্দু তুলে আনার চেষ্টা করেছি। এর চেয়ে বেশির অবকাশ নেই আমাদের সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

বলো, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' কেবল জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (সূরা যুমার, আয়াত নং-৯)

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যারা ইলম ওয়ালা (আলেম), তাদের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং-১১)

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৮)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর একাত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের সাথে ফেরেশতা ও আলেমগণকেও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে উলামায়ে কেরামের অধিক মর্যাদার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠে।

আলেমের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

عن أبي أمامة الباهلي، قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. "

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير".

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এমন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল- যাদের একজন আবেদ আর অন্যজন আলেম। (অর্থাৎ উভয়ের মাঝে কার মর্যাদা বেশি?)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: একজন আবেদের উপর একজন আলেমের ফযীলত সেরূপ তোমাদের মধ্যে একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার ফযীলতের যেরূপ।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির (আলেমের) মর্যাদা বৃদ্ধি করেন যে মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়। তদ্রূপ তাঁর ফেরেশতা এবং আসমান ও যমীনের সব অধিবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দুআ করে। তিরমিযী : ২৬৮৫

তালেবে ইলম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، (وإن الأنبياء -في رواية-) لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। আর ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেন।

আর আলেমের জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই, এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে। আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা এরূপ, যেমন চাঁদের মর্যাদা সমগ্র তারকারাজির উপর।

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী। আর নবীগণ উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে কোনো দীনার-দিরহাম (ধন-সম্পদ) রেখে যাননি। বরং তাঁরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে রেখে গিয়েছেন ইলম।

সুতরাং যে ইলম অর্জন করল, সে বড় অংশ লাভ করল। (মুসনাদে আহমদ: ২১৭১৫। আবু দাউদ, তিরমিযী)

ইলমের পথে সৃষ্টিকুলের নৈস্বর্গিক অভ্যর্থনা

ইলমের মর্যাদা ও ফযীলতের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটি বিশেষ চিত্র ফুটে উঠে। তা হলো, একজন তালিবুল ইলম যখন ইলম অন্বেষণে বের হয়, তাকে কেন্দ্র করে পুরো সৃষ্টিজগতে এক নৈস্বর্গিক আবহ তৈরি হয়।

ভাবখানা এমন, যেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সব কিছু সম্মিলিতভাবে কোনো এক শুভ পথের মহান অভিযাত্রীকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সবাই

আনন্দিত হয়ে তার কল্যাণ কামনা করছে। ফেরেশতারা ছুটে এসে তার পদতলে নূরের ডানা বিছিয়ে দিচ্ছে। আর যারা এসে পথের পাশে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারছেনা, তারাও নিজ নিজ স্থান থেকে তার জন্য শুভকামনা করছে। সমুদ্রের মাছ ও গর্তের পিপিলিকা সহ সব কিছু তার জন্য দুআ করছে।

একজন তালিবুল ইলমের এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে সবার এই প্রফুল্লতার কারণ একটাই, তা হলো এই তালিবুল ইলম, দীনের যে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে– তার মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও তার সুন্দর পরিণাম এবং সুফলের কথা তারা সবাই জানে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই জ্ঞান দান করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ফেরেশতাকুল ও অন্যান্য মাখলুক সার্বক্ষণিক আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা হাজারো প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে আল্লাহকে চিনে ও তাঁর ভালোবাসা অন্তরে লালন করে, এবং সেই ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাঁর সামান্য সন্তুষ্টির আশায় নিজের সবকিছু কুরবান করে।

আর ইলমই হচ্ছে সেই মহান উদ্দেশ্য পূরণের পথে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও তাওফীকের পর একমাত্র পাথেয়।

কেননা ইলমের উপরই নির্ভর করে আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে চেনা, তাঁর বড়োত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা, তাঁর উৎকৃষ্ট সকল গুণাবলি বোঝা, আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং আমাদের উপর তাঁর নেয়ামত সমূহের অনুভূতি জাগা, এবং এর দাবি হিসেবে আমাদের উপর তাঁর হকসমূহ বোঝা ও আদায় করা।

তেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টিজগত, বিশেষত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের হক বোঝা ও আদায় করা, ইত্যাদি বিষয় ইলমের উপরই নির্ভর করে।

তদ্রূপ তাঁর আদেশ ও নিষেধের গুরুত্ব অনুধাবন পুরষ্কারের নিশ্চয়তা উপলব্ধি করে প্রশান্তচিত্তে সেগুলো পালন ও তাঁর ভয় দিলে এনে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা— এ সবই নির্ভর করে ইলমের উপর।

এজন্য যখন কেউ ইলম অর্জনে বের হয়, পুরো সৃষ্টিজগত এতে আনন্দিত হয় ও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে আসে। তার জন্য দুআয় লিপ্ত হয়। কারণ তারা দেখে যে, এর দ্বারাই আল্লাহ পাকের এ মহাজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে।

ইলমের পথে শয়তানের মহা ষড়যন্ত্র

অপরদিকে শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু, তার সবসময়ের প্রচেষ্টা কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা যায়। মানবসৃষ্টির শুরুতেই সে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁর সামনে ঘোষণা করেছিল, যেকোনো ভাবে হোক, গোটা মানবজাতিকে বিপথগামী করে জাহান্নামে নিয়েই ছাড়বে। আর সে ভালো করে জানে যে, মানবজাতিকে বিপথগামী করার প্রথম ও প্রধান কৌশল তাকে ইলম থেকে বঞ্চিত করা।

কারণ একজন মানুষ যখন ইলম থেকে মাহরূম হয়, তার মাঝে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করার যোগ্যতা আর থাকেনা, সে ভালো আর মন্দ চিনতে পারেনা। ফলে তাকে যেকোনো গুনাহেই লিপ্ত করা যায় এবং গুনাহ করার পরও তার মনে অনুশোচনা তৈরি হয়না। ফলে সে গুনাহের উপরই বহাল থেকে যায়।

এবং শয়তান এটাও বুঝে যে, একজন হক্কানী আলেম যখন কোনো সমাজে থাকবে, সে সমাজের সাধারণ মানুষদের দ্বারাও অপরাধ সংঘটিত করা যাবেনা। কারণ হক্কানী আলেম সমাজের দায়িত্বশীল হিসেবে সমাজের মানুষকে অন্যায় সম্পর্কে বোঝাবেন। তার ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন। ফলে ভালো-মন্দের জ্ঞান ও আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে থাকার কারণে তারা আর শয়তানের ধোঁকায় পড়বেনা, প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরাধে জড়িত হবেনা। এতে করে শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যাবে।

মোটকথা ইলমের আলোতে একজন মানুষ নিজে সঠিক পথে চলার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সত্যের পথে, ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহবান করতে পারে। ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ছোট বড় প্রত্যেকটি কাজ সঠিকভাবে কল্যাণকর রূপে সম্পাদন করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়া আখেরাতে শান্তি লাভের পথ ও পদ্ধতি আলেমগণই বুঝেন এবং তাদের দিক নির্দেশনায়ই একটি জাতি তাদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।

সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলেমদের কারণেই শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য পূরণে আলেমগণই একমাত্র বাঁধা। তাই হাদীস শরীফে এসেছে—

فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.

অর্থাৎ একজন বিজ্ঞ আলেম শয়তানের মোকাবেলায় এক হাজার আবেদের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী।

এজন্য শয়তান সর্বাত্মক চেষ্টা করে একজন তালিবুল ইলমকে ইলম অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে। পুরোপুরি না হোক, সামান্য পরিমাণ ইলম থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে পারাকেও সে নিজের জন্য বড় সফলতা মনে করে।

তাই সে ইলমের পথে বিপরীতমুখী এক কঠিন ও নিকৃষ্ট অভিযানে অবতীর্ণ হয় এবং তালিবুল ইলমকে ইলমের পথ থেকে বিচ্যুত করার ভয়ানক সব ষড়যন্ত্রের ছক আঁকে।

আমাদের বড়দের কাছ থেকে শুনেছি,[৭] ইবলিস তার বাহিনীকে নিয়ে প্রতিদিন পানির উপর বৈঠকের আয়োজন করে এবং তার বাহিনীর সদস্যদেরকে ছেড়ে

---

[৭] এই ঘটনা এভাবে সবিস্তারে যদিও আমরা কোনো কিতাবে পাইনি, তবে এক্ষেত্রে আমাদের মুরুব্বিদের কথার উপর আস্থা রাখা যায়। হয়তো তাঁরা কোনো কিতাবে পেয়ে থাকবেন, সে পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পৌঁছেনি। এছাড়া মূল বিষয়টা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ على الماءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرايَاهُ، فأَدْناهُمْ منه مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فيَقولُ: فَعَلْتُ كَذا وكَذا، فيَقولُ: ما صَنَعْتَ شيئًا، قالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فيَقولُ: ما تَرَكْتُهُ حتّى فَرَّقْتُ بيْنَهُ وبيْنَ امْرَأَتِهِ، قالَ: فيُدْنِيهِ منه ويقولُ: نِعْمَ أَنْتَ. صحيح مسلم (٢٨١٣).

উপরোক্ত এই ঘটনায় যদিও যে সদস্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করেছে— শয়তান তাকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করছে, তবে আমাদের ঘটনার সাথে মূলত এই হাদীসের কোনো বিরোধ নেই। কারণ হাদীসে বর্ণিত ঘটনার দিন সবচেয়ে বড় কাজ এই বিভেদ তৈরি করাই ছিল। তাই অন্য কোনোদিন ভিন্ন কোনো কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে সে কাজ বাস্তবায়নকারীকে পুরস্কৃত করা এই হাদীসের বিপরীত নয়, বরং এই হাদীস থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

তাছাড়া কুরআন হাদীসের আলোকে ঘটনার বিষয়বস্তু যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত, ইলম থেকে মাহরূম করাকেই শয়তান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে এবং এর উপর সে সবচেয়ে বেশি খুশিও হয়। অতএব যেদিন কেউ কোনো তালিবুল ইলমকে ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারে, সেদিন বড় শয়তান তার উপরই সবচেয়ে খুশি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দেয়, তারা যেন মানব সমাজে ঢুকে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে সকল পাপে লিপ্ত করে। এরপর দিনশেষে একে একে সমস্ত সদস্যদের থেকে তাদের দৈনন্দিনের কার্যকলাপের বিবরণ শুনে। যে যত বড় অন্যায় করে তাকে তত বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করে।

একদিন এমনই এক বৈঠক চলছিল। সেখানে অন্যান্যদের সাথে একটা দূর্বল শয়তানও উপস্থিত ছিল। প্রতিদিনের মতো সকলে নিজ নিজ কর্মের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঐ দুর্বল শয়তান পেছনে চুপচাপ বসে ছিল। কারণ, তার মনে হচ্ছিল, আজকে সে বড় কোনো কাজ করতে পারেনি। যা করেছে সেটা শুনলে বড় শয়তান খুশি হবে না।

সবার কথা শেষ হলে বড় শয়তান তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কিরে তুই কি করেছিস? কিছু বলছিস না যে! সে নিম্ন স্বরে বিনয়ের সাথে বললো, আজ আমি তেমন কিছু করতে পারিনি। বড় শয়তান বলল, আচ্ছা ছোট হোক তাই বল দেখি কী করেছিস!

সে বলতে লাগল, একজন তালিবুল ইলম মাদরাসায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। রাস্তায় এক জায়গায় অন্যান্য বাচ্চারা খেলাধুলা করছিলো। আমি ঐ ছাত্রের মনে ওয়াসওয়াসা দিয়ে তাকে খেলা দেখানোয় মত্ত করে দেই। ফলে সে আর মাদরাসায় যায়নি।

তার কথা শুনে বড় শয়তান খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, আরে সবচেয়ে বড় কাজটাই তো তুই করেছিস! তুই তো সবচেয়ে বড় পুরষ্কার পাওয়ার উপযুক্ত! এই বলে সে সবার মধ্যে তাকেই ঐ দিনের বড় পুরস্কারটা দেয়। অথচ অন্যরা মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিভেদ বাঁধানো, চুরি ডাকাতি এমনকি খুন-খারাবি সহ অনেক বড় বড় গুনাহের কাজেও মানুষকে লিপ্ত করিয়েছে।

তখন অন্যরা তাকে প্রশ্ন করে যে, চুরি ডাকাতি ও খুনখারাবির মত বড় বড় বিষয়কে আপনি বড় করে না দেখে একটা তুচ্ছ কাজকে এত বড় করে দেখছেন কেন– তা তো আমাদের বুঝে আসছে না!

উত্তরে বড় শয়তান তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝায় যে, দেখো তোমাদের সকলের ছোট বড় সকল কাজ নির্ভর করে তার এ কাজের উপর। কারণ ইলমের পথে